Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইস্তেগফার ও তাওবা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজু মান আরা

রোলঃ 216021092

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইস্তেগফার ও তাওবা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজু মান আরা

রোলঃ 216021092

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ইস্তেগফার ও তাওবা

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইস্তেগফার ও তাওবা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনজু মান আরা, আইডিঃ 216021092 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইস্তেগফার ও তাওবা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

আনজু মান আরা

আইডিঃ 216021092

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা : 6

গুনাহ-এর প্রকারভেদ 6

গুনাহের অপকারিতাঃ 6

ইসতিগফারের কারণসমূহ 8

১. মানুষের সহজাত ঘাটতিঃ 8

২. আমলের ঘাটতিঃ 9

৩. বাহ্যিক পাপঃ 11

৪. গাফিলতির পাপঃ[৯] 11

৫. অন্তরের রোগঃ 12

৬. গোপন ও অপ্রকাশ্য গুনাহ 14

৭. অজ্ঞাত গুনাহ 16

যে সকল সময় ইস্তেগফার করা মুস্তাহাব: 17

তাওবা এর আক্ষরিক অর্থ 19

তাওবার প্রয়োজনীয়তা ও তার গুণাগুণ: 19

তাওবা সম্পর্কে সলফে সালেহীনদের বক্তব্য: 21

তাওবার সময় 24

তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার লক্ষণ 26

তাওবা কবুল না হওয়ার লক্ষণ: 27

তাওবাকারীদের শ্রেণীবিভাগ 28

তাওবার কিছু নিয়ম 30

বই এর রেফারেন্স সমূহ: 33

ভূমিকা :

আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ও তওবা কবুলকারী। আমরা মানুষরা কম বেশি সবাই ভুল করে ফেলি। জেনে না জেনে গুনাহ করে ফেলি। গুনাহের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতেও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আল্লাহপাক চান আমরা যেন তওবা করে উনার রহমতে ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি। কুরআনে যতবার জাহান্নামের শাস্তি ও আজাবের বর্ণনা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি বার আল্লাহর রহমত ক্ষমা ও তওবা কবুলের কথা আমাদেরকে জানানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি কখনো আল্লাহর রহমত প্রার্থী থেকে হতাশ হতে পারে না ইনশাআল্লাহ। ইস্তেগফার এর বিশাল রহমতের কথা যদিও বলে শেষ করা যাবেনা তবু এখানে চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন আলোকিত ব্যক্তিদের আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরতে। যদিও তওবা ও ইস্তেগফার অনেকটা কাছাকাছি বিষয় তবুও দুটিকে একসাথে মিলিয়ে ফেললে হবে না।

তওবার অর্থ গুনাহ থেকে ফিরে আসা।আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।কোনোভাবেই পূর্বের গুনাহে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা।

ইস্তেগফার হচ্ছে গুনাহর ফলে হয়ে যাওয়া শাস্তির ভয়ে, প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

এই লেখায় ভালো যা কিছু সব আল্লাহর হুকুমে এবং যদি কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তা আমার নফস এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহুম্মাগফিরলি।

গুনাহ-এর প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. কবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ; যেমন শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ'আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

২. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ; যেগুলো কাবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো ইত্যাদি।

গুনাহের অপকারিতাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন," অর্থাৎ তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে থাকো যা হতে তোমাদের (কঠিন ভাবে) বারণ করা হয়েছে তা হলে আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে। "(সূরাহ নিসা 31)

বহু জাতির ধ্বংস,বহু পরিবারের অধঃপতন,সর্বত্র মত ও পথের দ্বন্দ্ব, অন্তরের কঠিনতা ও বিনাশ, রিজিকের অপবিত্রতা,আল্লাহর ক্ষোভ,মানুষের মধ্যকার ভয় ভীতি ও অস্থিরতা, জাহান্নাম ও শাস্তির ব্যবস্থা সবই তো গুনাহের কারণেই।তাই আমাদের

সকলকেই গুনাহ সমূহ থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। তাই গুনাহের অপকারিতা সমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

ছোট পাপগুলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত, রমাদ্বানে রোজার মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ।

গুনাহর বিভিন্ন অপকারিতা নিম্নরুপ:

১.গুনাহগার ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। কারন,ইলম হচ্ছে নূর বা আলো। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে তা দান করেন। গুনাহ সেই নূরকে নিভিয়ে দেয়।

২.গুনাগার ব্যক্তি গুনাহর কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন.. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গুনার কারণেই রিজিক থেকে বঞ্চিত হয় "

(উল্লেখ্য যে কারো কারো নিকট উক্ত হাদিস শুদ্ধ নয়।)

৩.গুনাহার কারণে গুনাহগারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব তৈরি হয় আল্লাহর সাথে দূরত্ব তৈরি হয়।

৪.গুনার কারণে আস্তে আস্তে ওই ব্যক্তি নেক ব্যক্তিদের কাছ থেকে অতঃপর পরিবারের কাছের মানুষদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে শয়তানের প্ররোচনায়। এতে একসময় নিজের উপরও বিরক্ত ভাব জন্ম নেয় যার পরিণতি কখনোই ভালো হয় না।

৫.গুনাহর কারণে গুনাহগারের সকল কাজকর্ম তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

৬.গুনাহর কারণে অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

৭.ধীরে ধীরে গুনাহর কারণে গুনাহগারের অন্তরও শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে।

৮.গুনাগার ব্যক্তি গুনাহর কারণে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য তথা নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়।

৯.গুনাহ বয়স বা উহার বরকত কমিয়ে দেয়।যেমনিভাবে নেক কাজ বয়স বা উহার বরকত বাড়িয়ে দেয়।

১০.একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহর জন্ম দেয়।

১১.গুনাহগারের অন্তর বারবার গুনাহর ইচ্ছা পোষণ করতে করতে আর ভালো ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না।

১২.গুনাহ করতে করতে গুনাহকে গুনাহ মনে করার চেতনাটুকুও গুনাগারের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

১৩.গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহর মাধ্যমে পূর্বের কোন এক অভিশপ্ত তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির যোগ্য ওয়ারিশ হিসেবে গন্য হয়।

১৪. গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহতালা দৃষ্টিতে একেবারে গুরুত্বহীন।

১৫.গুনাহ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় তার নিকট বড় বড় গুনাহ ও ছোট মনে হয়।

১৬ গুনাহর কারণে শুধু গুনাহগারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তাতে অন্য পশু, অন্য মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৭.গুনাহ গুনাহগার ব্যক্তির অসম্মান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়।

১৮.গুনাহ গুনাহগারের মেধা নষ্ট করে দেয়।

১৯.গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তরের ওপর ভ্রষ্টাচারের সিলমোহর পড়ে যায়।

২০.কিছু কিছু গুনাহর উপর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ফেরেশতাদের লানত রয়েছে। যেমন আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করে যেসব নারীরা,উদাহরণ স্বরুপঃভ্রু প্লাক, দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি,পরচুলা লাগানো, সুদ খোর, সুদদাতা, তাদের লেখক ও সুদের সাক্ষী দ্বয়, মহিলাদের সাজ নেওয়া পুরুষদের, পুরুষদের সাজ মতো চলনে উৎসাহী নারীদের, ছবি ও মূর্তি ধারণকারী, সমকামীদের।

২১.গুনাহগার ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের দুয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

২২.কিছু গুনাহের শাস্তি মৃত্যুর পর পরই শুরু হয়ে যায়।যেমনঃ জিনাকারী ও সুদখোর।

২৩.গুনাহর কারণে পৃথিবীর পানি, বাতাস, ফলমূল, শস্য, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যায়।

২৪.গুনাহের কারণেই পৃথিবীতে ভূমিধস, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এমন কি ভূমি থেকে বরকত একেবারেই উঠে যায়। আল্লাহুম্মাগফিরলি।

২৫.গুনাহ করতে করতে গুনাহগারের অন্তর থেকে ইসলামী চেতনার মানব আত্মসম্মানবোধ একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

২৬.গুনাগার অন্তর থেকে গুনাহের কারণে লজ্জা বোধ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। লজ্জাশীলতা তো কল্যাণেই কল্যাণ।

গুনাহর চিকিৎসা :

যারা গুনাহ নামক কঠিন রোগে ভুগছেন, সর্বদা বিপদ আপদে নিমজ্জিত রয়েছেন,বিষন্নতায় কাহিল, রিজিকের ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত।তাদের সকলের জন্য রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য মহৌষধ ইস্তেগফার।

আল্লাহ তাআলা বলেন, নুহ আলাইহিসসালাম নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল আমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে, তোমাদের জন্য তৈরি করেন উদ্যান সমূহ এবং প্রবাহিত করবেন নদীমালা (সূরা নূর ১০ - ১২)

আব্দুল্লাহ বিন বুসুর রাঃ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন অর্থাৎ তার জন্য মহা সুসংবাদ যে নিজ আমলনামায় প্রচুর পরিমাণ ইস্তেগফার দেখতে পেয়েছেন (ইবনে মাজাহ:হাদিস
৩৮১৮)

ইস্তেগফারের বিশুদ্ধ শব্দ সমূহ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

১.আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২.আল্লাহুম্মা ফিরলি অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

ইসতিগফারের কারণসমূহ

১. মানুষের সহজাত ঘাটতিঃ

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ যতটা প্রশংসা বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য; মাখলুকের পক্ষে ততটা প্রশংসা বা ইবাদত করা সম্ভব না। আর যদি (আল্লাহ যতখানি ইবাদতের যোগ্য তা করা) সম্ভবও হতো, তবুও আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত তার পক্ষে এটি সম্ভব হতো না। আর, বান্দা যদি তার পুরো জীবন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে কাটিয়ে দিত, তবুও সে আল্লাহর প্রাপ্য হক আদায় করতে পারত না। এরপরও বান্দা যে সামান্য নেক আমল করে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট থাকেন। এই ইবাদত বান্দার জন্য কঠিন হয় না, তাদেরকে খুব একটা সময়ও ব্যয় করতে হয় না।

সহীহাইনে আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকেরা প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেন: আমাকেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন।[1]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। বান্দার কাছে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, বরং বান্দাই সর্বদা তাঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এরপরও তিনি তাদেরকে প্রচুর নিয়ামত দান করেন, যেমনটি মুসলিমে আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[১] সহীহ বুখারি: ৫৬৭৩

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে তার জন্যে রয়েছে দশগুণ প্রতিদান; আর আমি তাকে আরও বৃদ্ধি করে দেব। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কর্ম করবে তার প্রতিদান সে কর্মের সমান অথবা আমি তাকে মাফ করে দেব। যে আমার প্রতি এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দু' হাত (এক গজ) অগ্রসর হই। যে আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়িয়ে আসি। যে আমার সাথে কাউকে শরিক করা ব্যতীত পৃথিবী তুল্য গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, তাহলে আমিও তার সাথে পৃথিবী তুল্য ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করি।[২]

যদিও ইবাদতে বান্দার তেমন একটা সময় ব্যয়িত হয় না; এবং দুনিয়ার বয়সের তুলনায় তার বয়স অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; এবং আখিরাতের তুলনায় পুরো দুনিয়া চোখের পলকের মতো; এরপরও বান্দা তার ক্ষুদ্র জীবনে যে সামান্য ইবাদত করে, আল্লাহ সেটার জন্য তাকে পুরস্কৃত করেন। এমন পুরস্কার, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, কোনো মানবহৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি। সে জান্নাত এত বিশাল হবে যা আসমান-জমিনের ব্যাপ্তির চেয়েও বিশাল, যে জীবনের কোনো শেষ নেই। সহীহ হাদীসে এসেছে, [৩] জান্নাতের সবচেয়ে কম মর্যাদার ব্যক্তিও দুনিয়ার দশগুণ আয়তনের বৃহৎ জান্নাত লাভ করবে। আমরা এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না, কেবল বিষয়টি উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। তাই, বান্দা যখন আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তার ঘাটতি সম্পর্কে জানতে পারে; এবং এই ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সে কিয়ামত-দিবসে পুরস্কার হিসেবে যা পাবে তা জানতে পারে, তখন তার অন্তরে ইসতিগফার করার তীব্র বাসনা জন্মায়।

২. আমলের ঘাটতিঃ

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে যেসব ফরজ আমল, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যিনি

[২]সহীহ মুসলিম: ২৬৮৭

[৩]সহীহ মুসলিম: ১৮৬; তিরমিযি:৩১৯৮

এসব ইবাদত ঠিক সেরূপেই আমল করেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করতেন। এর কারণ-সামর্থ্যের ঘাটতি, ইলমের কমতি এবং গাফিলতিসহ নানা বিষয়। সুতরাং, বান্দার কোনো ইবাদতই ত্রুটিমুক্ত নয়। ব্যক্তি বিশেষে ত্রুটির পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। সুতরাং, বান্দার ইবাদতে কিছু-না- কিছু ত্রুটি থেকেই যাবে, অথবা ইবাদত পালনের সময় তাতে রিয়া[৪] বা উজব[৫]-এর বিষ প্রবেশ করায় সেটির সওয়াব কমে

যাবে। এ কারণে যেকোনো ইবাদতের পর সেটির ত্রুটি পুরণ করার জন্য ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায়ের পর তিনবার ইসতিগফার করতেন।[৬] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন

করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু। [সূরা বাকারা, ২: ১৯৯]

এবং সহীহাইনে ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ বা উমরা থেকে ফিরে আসার সময় বলতেন:

'আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী, আমরা আমাদের রবের উদ্দেশ্যেই সিজদাকারী, তাঁরই প্রশংসকারী। [৭]

আল্লাহ সূরা মুযযাম্মিলের শেষ আয়াতে কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে বলেছেন,

"আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ২০]

[৪] লোক দেখানো মনোভাব।

[৫] আত্ম-অহংকার, গৌরব থাকা। লেখক এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলছেন, যে ইবাদাতের কারণে নিজেকে সম্মানিত ও আত্মগৌরবের দৃষ্টিতে দেখে।

[৬] সহীহ মুসলিম: ৫৯১

[৭] সুনানু আবী দাউদ: ২৭৭০

আল্লাহ আরও বলেন,

....যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।' [সূরা আ-লি ইমরান, ৩: ১৭]

আর (এ আয়াতের ব্যাপারে) কিছু আহলুল ইলম বলেছেন যে, এটি (ইসতিগফার) করতে হবে কিয়ামুল লাইলের পর। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জীবনের যে জীবন ছিল দাওয়াত, জিহাদ ও কল্যাণে ভরপুর- ইতি ঘটে ইসতিগফারের মাধ্যমে। সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বারবার এ দুআ পড়েছিলেন:

'মহান পবিত্র আল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছেই তাওবা করছি। [৮]

আর (ইবাদতের পর ইসতিগফার করার) অসংখ্য দলিল আছে। তাই ইবাদতে যে ঘাটতি ও অপূর্ণতা ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় ইসতিগফার বৃদ্ধির দ্বারা সেগুলোর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হয়।

৩. বাহ্যিক পাপঃ

ইসতিগফারের তৃতীয় কারণ হলো সুপরিচিত বাহ্যিক পাপ ও প্রকাশ্য নিষিদ্ধ কাজসমূহ। যেমন-যিনা, রিবা, চুরি, অন্যের বিরুদ্ধে যুলুম এবং জিহ্বার নানা রোগ যা সৃষ্টির মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে; যেমন মিথ্যা বলা, গিবত করা, অপবাদ দেওয়া, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি। এ পাপগুলোর ব্যাপারে মানুষ জানে। এগুলো এত পরিচিত পাপ যে, মানুষ মনে করে কেবল এসব পাপের জন্যই ইসতিগফার করতে হয়। ইসতিগফার করার যে আরও অনেক কারণ রয়েছে, সেগুলো তারা জানে না। তাই দেখা যায়, অনেকেই এ পাপগুলো করার পর ইসতিগফার বাড়িয়ে দিলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসতিগফার করার ব্যাপারে সে হয় একেবারেই উদাসীন। অথচ এমনও হতে পারে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রেই তার ইসতিগফার করা অধিক জরুরি ছিল। আমরা সামনের আলোচনায় এ ব্যাপারে জানতে পারব, ইন-শা-আল্লাহ।

[৮] সহীহ মুসলিম :৪৮৪

৪. গাফিলতির পাপঃ[৯]

ইসতিগফারের চতুর্থ কারণ হলো গাফিলতি বা উদাসীনতায় সংঘটিত পাপ। গাফিলতির পাপ হলো আল্লাহ যেসব কাজের আদেশ করেছেন সেগুলো "পরিত্যাগ করা"। যেমন, বান্দা তার হাত বা জিহ্বা দিয়ে পাপ করার পর তা বুঝতে পারলে আল্লাহর তাওফীকে সে তাওবা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, কখনো কখনো সে এমন পাপ করে যা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (সরাসরি) করেনি; বরং সে হয়তো আল্লাহর আদেশকৃত কোনো বিধান পরিত্যাগ করেছে। ফলে সে এসব পাপের ব্যাপারে গাফিল থাকে। আর (এসব পাপের) অধিকাংশই অন্যের অধিকার সংক্রান্ত। যেমন: পিতা-মাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অধিকার এবং এক মুসলিমের ওপর অন্য মুসলিমের অধিকার ইত্যাদি। এ ছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধও এর অন্তর্ভুক্ত। হয়তো কোনো মুসলিম দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো একটি নেককাজ থেকে বিরত থাকে, অথবা কোনো পাপকাজ সংঘটিত হতে দেখে (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাত বা জিহ্বা দিয়ে) বাধাপ্রদান করে না। এমনকি ক্রমাগত গুনাহের পরিবেশে থেকে সে এতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এক পর্যায়ে সে এমন অবস্থায় নেমে যায় যে, গুনাহের ব্যাপারে সে অন্তরে কোনো ঘৃণাও পোষণ করে না। আর এটি দুর্বলতম ঈমান।[১০] আর এ সকল পাপ তার অজান্তেই তার নামে লেখা হয়। আর এজন্য আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে ইসতিগফার করা বান্দার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে।

[৯] এই পাপগুলো পূর্বে উল্লেখিত পাপের বিপরীত। পূর্বোক্ত তৃতীয় কারণটি হচ্ছে সচেতন অবস্থায় পাপ করা। কিন্তু এ পাপটি আল্লাহ মানুষের ওপর যা আদেশ করেছেন সে বিষয়ে অমনোযোগী হওয়ার কারণে সংঘটিত হয়। এই গুনাহগুলো আগের গুনাহের মতো পরিষ্কার ও প্রকট নয়।

[১০] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ দেখতে পায় আর সে তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, তবে সে দায়িত্বমুক্ত হলো। যদি তার হাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাই মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সেও দায়িত্বমুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, আর সে মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সেও দায়িত্বমুক্ত হলো; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান। [সুনানুন নাসায়ি : ৫০০৮]

৫. অন্তরের রোগঃ

এগুলো মূলত অন্তরের রোগ; যেমন অহংকার, উজব, ঔদ্ধত্য, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি। এ রোগগুলো বাড়তে বাড়তে যেমন (আকারে) পর্বতের মতো বিশাল হতে পারে, তেমনি অণুর মতো ক্ষুদ্রও হতে পারে। সাধারণত অন্তরের এসব রোগ[১১] থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা বেশ কঠিন ব্যাপার। এসব পাপের কুপ্রভাব ও ক্ষতি নিম্নরূপ:

১. অনেকে এসব রোগের ব্যাপারে উদাসীন; এমনকি অনেক নেককার [১২] বান্দাও। যেমন আপনি দেখতে পাবেন, আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা দ্বীনের ব্যাপারে বেশ কঠোর-তারা আল্লাহর শরীয়া মেনে চলার চেষ্টা করে, বাহ্যিক গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে-কিন্তু তারা হয়তো এক বা একাধিক অন্তরের রোগ দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে।

২. আল্লাহ কোনো বান্দার অন্তরকে পরিশুদ্ধ না করলে তা সর্বদাই কোনো-না- কোনো অন্তরের রোগে আক্রান্ত থাকে।

৩. অন্তরের রোগ পুরো দেহকে আক্রান্ত করতে পারে। যেমনটি নু'মান ইবনু বাশীর

রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "জেনে রেখো, শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরো

আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই ঠিক হয়ে যায়। আর তা খারাপ হলে গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো কলব বা অন্তর।[১৩]

৪. অন্তরের কিছু রোগ আছে যেগুলো খুব ছোট মনে হলেও এর প্রভাব মারাত্মক হয়। যেমন, অহংকার। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র

[১১]হৃদয় সর্বদা অন্তরের রোগে আক্রান্ত থাকে। হয় সেগুলোকে তাযকিয়াতুন নুফুসের সাহায্যে পরিশুদ্ধ করতে হয়, নয়তো রোগ বাড়তে থাকে।

[১২]তারা সুস্পষ্ট পাপ থেকে বেঁচে থাকলেও অন্তরের রোগ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারে না।

[১৩] নু'মান ইবনু বাশীর (বদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি। অর্থাৎ- বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, রাবী বলেন: (এ সময় নু'মান তার আঙ্গুল দুটি দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন, নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান। প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। জেনে, রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো, তা হলো 'কলব' তথা হৃদয়। [সহীহ মুসলিম: ১৫৯৯]

সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৪]

এটিই প্রমাণ যে, সামান্য পরিমাণ কবীরা গুনাহের কারণেও (জাহান্নামের মতো) কঠোর শাস্তি পেতে হতে পারে।

৫. সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে, অন্তরের রোগ প্রায়ই গোপন থাকে বলে ব্যক্তি এ গুনাহের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। সত্যি বলতে, 'সরিষার দানা' আকৃতির রোগ কোনো ব্যক্তির পক্ষে ধরা সম্ভব না। তাহলে এটি ধরা কতটা কঠিন হবে যদি হৃদয় "আবেগ ও অন্যান্য অনুভূতির" দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা অনু পরিমাণ রোগকেও আড়াল করে রাখে? এর উপস্থিতি নির্ণয় প্রায় অসম্ভবপর হয়ে যাবে।[১৫]

[১৪] সহীহ মুসলিম: ৯১

[১৫] আর এখান থেকে একজন আহলুল ইলমের ভুল বোঝা যাবে যিনি উল্লেখ করেছেন যে, "ইসবাল" "খু ইয়ালা” ব্যতীতও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে খু ইয়ালা মাথাতেই আসে না। কিন্তু এটি ভুল। ইসবালের ক্ষেত্রে অন্তরে খু ইয়ালা অনুভব করতে হবে এর জরুরাত নেই। কারণ, খু ইয়ালার নানা স্তর আছে। বরং, অন্যান্য অন্তরের রোগের মতো এরও নানা স্তর আছে। যে মুসবিল ইসবালের চরম শাস্তির ব্যাপারে অবগত, এরপরও সে ইসবালে অটল থাকে, সে এটি তার অন্তরে খু ইয়ালার অস্তিত্ব থাকার জন্যই করে। আমি এ ব্যাপারে ইমাম শাওকানি (রহিমাহুল্লাহ)-এর জবাবে একটি নিবন্ধ লিখেছি। আল্লাহ গ্রন্থটির প্রকাশ সহজ করে দিন। [লেখকের ফুটনোটের এখানেই শেষ)

আল-ইসবাল। কোনো পুরুষ যখন অহংকারবশত তার লুঙ্গি, শার্ট বা পাগড়ি টাখনুর নিচে নামিয়ে দেয়।

খু ইয়ালা:আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রতারণা, অহংকার

মুসবিল: যে ব্যক্তি ইসবাল করে।

ইসবাল নিষিদ্ধের ব্যাপারে হাদীস:

প্রথম হাদীস:
সালিম ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। পাজামা, জামা ও পাগড়ির মধ্যে 'ইসবাল' বা মাত্রাধিক্যতা আছে। কাজেই, যে ব্যক্তি এসব ব্যবহারের সময় সীমালংঘন করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। [সুনানু আবী দাউদ: ৪৪৫০]

৬. গোপন ও অপ্রকাশ্য গুনাহ

ইসতিগফারের ষষ্ঠ কারণ হলো বান্দার গোপন পাপ। অধিকাংশ সময় বান্দার অজান্তেই এসব পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ পাপগুলোর উদাহরণের ভেতর পঞ্চম কারণের পাপগুলোও রয়েছে। এ ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গুনাহও এর অন্তর্ভুক্ত। গোপন পাপের কিছু প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

১. গোপন শিরক: নেককাজ করার সময় লোক দেখানো মনোভাব তৈরি হলে সেটাকে বলা হয় রিয়া। রিয়া হলো গোপন শিরক। অনেক সময় এই শিরক বান্দার অজান্তেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই একে 'গোপন শিরক' বলা হয়। তাই নেক কাজে এর উপস্থিতি থাকলে এটিকে "রিয়া" বলা হবে। আর কথায়, বচনে এর উপস্থিতি থাকলে তাকে বলা হবে "সুম'আহ"। এবং এর কাফফারা হিসেবে যা বলতে হবে তা অসংখ্য দুর্বল হাদীসে এভাবে এসেছে যে-

হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।[১৬]

আর এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।" যা নির্দেশ করে, কোনো ব্যক্তি নিজের অজান্তেও এতে পতিত হতে পারে।

আবু হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: ইযারের বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নিচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে। [সহীহ বুখারি: ৫৭৮৭]

তৃতীয় হাদীস:
হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বা তার জঙ্ঘা (হাটুর নিচের মাংসপেশী) ধরে বলেন এটা হলো লুঙ্গি বা পায়জামার জায়গা। তুমি না মানতে চাইলে আরও নিচে নামাতে পারো। যদি তাও মানতে রাজি না হও তবে জেনে রাখো, লুঙ্গি-পায়জামার পায়ের গোছা স্পর্শ করার কোনো অধিকার নেই। [তিরমিযি: ১৭৮৩]
[১৬] আল আদাবুল মুফরাদ: ৭১৬

২. গোপন প্রবৃত্তি: শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ [১৭] সূত্রে, এবং তিনি মারফু [১৮] সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "হে আরবগণ! আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা হলো রিয়া ও গোপন প্রবৃত্তি।" হাদীসটি সহীহ নয়। আহলুল ইলমগণ[১৯] একে (গোপন প্রবৃত্তি) "নেতৃত্বের ভালোবাসা" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ শ্রেণিতে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, মানুষের মুখে নিজের নাম ও প্রশংসা উচ্চারিত হওয়ার ভালোবাসা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ইলমওয়ালা ও ভালো লোকদের মধ্যেও "গোপন শিরক" ও "গোপন প্রবৃত্তি" ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যেমনটি কিছু সালাফ বলেছেন, "সিদ্দীকদের মাথায় সর্বশেষ যে জিনিসটি আসতে পারে তা হলো নেতৃত্বের ভালোবাসা।"

৩. সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং উল্লিখিতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হতে পারে এটি:
আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে

'কখনো কখনো বান্দা এমন কথা বলে, যার ভয়াবহতা সে বুঝতে পারে না; কিন্তু এরহি ওয়াসাল্লাম-কে কারণে সে জাহান্নামের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমাকাশের মধ্যস্থিত দূরত্বের তুলনায়ও বেশি দূরে গিয়ে নিপতিত হবে।[২০]

এ ছাড়া বুখারির আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'নিশ্চয়ই বান্দা পরিণাম চিন্তা ব্যতিরেকেই এমন কথা বলে, যে কথার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে ঢুকে যাবে যার দূরত্ব পূর্ব (ও পশ্চিম আকাশ) এর দূরত্বের চেয়েও বেশি।[২১]

[১৭] যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার)أثار(।
[১৮] যে হাদীসের সনদ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদীস বলে।
[১৯] যারা ইলম তথা জ্ঞানের ধারক-বাহক।
[২০] সহীহ মুসলিম: ২৯৪৪
[২১] সহীহ বুখারি: ৬৪৭৭

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সে বুঝতে পারে না" এবং পরের হাদীসে বলেছেন "চিন্তা ব্যতিরেকেই এমন কথা বলে" যা থেকে এ বিষয়টি কতটা মারাত্মক তা বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো-কিভাবে আমরা জানব যে, আমরা কোন শব্দটি গাফিলতি, অবহেলা, রাগের মূহুর্ত বা অন্য সময়ে বলে ফেলেছিলাম, যার কারণে আমাদের জন্য এমন কঠোর শাস্তি লেখা হয়ে গিয়েছে?

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি-তিনি যেন আমাদের জিহ্বাকে হিফাযতে রাখেন। যে বিষয়গুলো তাঁকে রাগান্বিত করে তা থেকে তিনি যেন আমাদের নিরাপদ রাখেন। তাঁর ক্ষমাশীলতা দিয়ে আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন।

৭. অজ্ঞাত গুনাহ

অজ্ঞাতে করা পাপের জন্যও ইসতিগফার করতে হয়। (এই কারণটি উল্লেখের) উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেক সময় বান্দা কোনো হারাম ও গুনাহের কাজ অজ্ঞতাবশে করে ফেলে। কাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার জানা ছিল না। এই পাপটি হারামে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হতে পারে, আবার আল্লাহর আদেশকৃত আমল ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। এ অজ্ঞতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তির ত্রুটির কারণে হতে পারে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইলম অর্জন করেনি। এ ক্ষেত্রে সে গুনাহগার।

২. আর যদি তার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি না-থাকে অথবা সে (ইলম অর্জনকেও) এড়িয়ে না গিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে তার কোনো পাপ হবে না। তবে যারা এসব

পাপ থেকে বিরত থাকে তাদের চেয়ে তার অবস্থান মর্যাদার বিবেচনায় নিচে হবে।

উভয় পরিস্থিতিতেই ব্যাপকভাবে ইসতিগফার করতে হবে। প্রথমটিতে তার পাপের কারণে, দ্বিতীয়টিতে তার কমতির কারণে।

সুতরাং, আমার প্রিয় মুসলিম ভাইবোনেরা, আপনারা যদি এসব কারণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন এবং এর আলোকে নিজেকে যাচাই করেন তবে অনুধাবন করবেনো যে, আপনার জন্য সর্বদা তাওবা ও ইসতিগফারে ডুবে থাকা অবশ্য কর্তব্য। এই উম্মতের ব্যাপকভাবে তাওবা করা প্রয়োজন; তারা সম্পূর্ণভাবে এর মুখাপেক্ষী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন

তাই আমাদের কর্তব্য হলো, ইসতিগফারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং মাসনুন দুআর সাহায্যে এতে অটল থাকা। যেমন,

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করার সময় এই দুআ পড়তেন,
হে আল্লাহ! তুমিআমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও; কম ও বেশি, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দাও।[২২]

এবং সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দুআ করতেন:

হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল- ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি এবং পরে যা হবে সেগুলো। যে গুনাহ আমি গোপনে করেছি আর যে গুনাহ প্রকাশ্যে করেছি। আর যেগুলো আপনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞাত আছেন সবই আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।।[২৩]

এ ছাড়া অনুরূপ আরও অনেক মাসনূন দুআ করা যেতে পারে।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের গুনাহ মাফ করে দেন পাপমোচন করেন, আমাদের তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং আমাদের ওপর তাঁর রহমতকে পূর্ণ করেন এবং আমাদেরকে ইসলামের ওপর মৃত্যুর তাওফীক দান করেন। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবিদের ওপর।

[২২] সহীহ মুসলিম: ৪৮৩

[২৯] সহীহ বুখারি: ৬৩৯৮

যে সকল সময় ইস্তেগফার করা মুস্তাহাব:

১. কোন ইবাদতের শেষে। কারণ মানুষ বলতেই তো তার ইবাদতে যেকোনো ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। যেভাবে ইবাদত করা উচিত তার শতভাগ আদায় করা হয় না। আল্লাহ তা' আলা বলেন "অর্থাৎ অতঃপর তোমরা সে দিক দিয়ে রওনা কর যেদিক দিয়ে রওনা করেছে অন্যান্য লোকেরা আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল"।
(সূরা বাকারা :১৯৯)

২.সেহরির সময় ইস্তেগফার: আল্লাহ তা'আলা সে সকল বান্দার প্রশংসা করেছেন যারা সেহরির সময় আল্লাহ তায়ালার নিকট ইস্তেগফার করেন আল্লাহ তায়ালা বলেন অর্থাৎ যারা ধৈর্যশীল, অনুগত, দানশীল ও রাতের শেষে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনাকারী।
(সূরা আল ইমরান :১৭)

৩.কোনো মজলিসের শেষে: আবু হুরায়রা (র:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন.. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: অর্থাৎ কেউ কোন মজলিসে বসে অযথা বেশি কথা বলে ফেললে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে,সুবহানাকা.... যার অর্থঃ হে আল্লাহ সব প্রশংসা পবিত্রতা বর্ননা করছি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া আর সত্য কোন মাবুদ নেই। উপরন্তু আমি আপনার নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি।

তাহলে উত্তর মজলিসে তার পক্ষ থেকে অযথা যা কিছু হয়েছে ক্ষমা করে দেয়া হবে।
(আহমাদ হাদিস ১০৪২০ তিরমিযী,চার ৩৪৩৩)
৪. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পরঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম একদা জনৈক সাহাবীকে দাফন করার পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন :অর্থাৎ তোমরা নিজ সাথী ভাই এর জন্য দোয়া কর এবং তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট প্রশ্নোত্তরের স্থিরতা ও অবিচলতা কামনা করো। কারণ তাকে এখনই প্রশ্ন করা হচ্ছে।
(আবু দাউদ, হাদিস ৩২২৩)

ইস্তেগফারের ফায়দা ও ফলাফল:
১. আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন।
২. রিজিক বৃদ্ধির একটি বিশেষ আমল।
৩. জান্নাতে যাওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৪. গুনাহ মাফের একটি বিশেষ মাধ্যম।
৫. মৃত্যুর পর মর্যাদা বৃদ্ধির একটি বিশেষ মাধ্যম।
৬. আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশেষ মাধ্যম।
৭. নিজ অন্তরকে পাক ও পবিত্র করার একটি বিশেষ মাধ্যম।
৮. সন্তান লাভের একটি বিশেষ মাধ্যম।
৯. শক্তি ও সুস্থতা ভোগ করা একটি বিশেষ মাধ্যম।

আবু মুসা আশ আরী (র:) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ একদা আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দুটি মাধ্যম ছিল। যার একটি চলে গিয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দ্বিতীয়টি এখনো আমাদের নিকট উপস্থিত রয়েছে, যা চলে গেলে আমরা একদা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাব।
(আহমাদ, হাদিস ১৯৫২৪)
একদা হাসান বসরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তেগফার করো। ঘরে-দুয়ারে, খাবার সময় রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, মজলিসে তথা সর্ব জায়গায়। কারণ, তোমরা জানো না কখন আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা নেমে আসবে।
(বায়হাকী শু আবুল ৬৪৭)
কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমাদের রোগ ও চিকিৎসা বলে দেয়। রোগ হচ্ছে গুনাহ আর চিকিৎসা হচ্ছে ইস্তেগফার (বায়হাকী শু আবুল ৭১৪৬)

সাইয়েদুল ইস্তেগফার :শাদ্দাদ বিন আউস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :অর্থ, সাইয়েদুল ইস্তেগফার হলো, তুমি বলবে... আল্লাহুম্মা আনতা... যার অর্থ হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির উপর

রয়েছি।আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত নিয়ামত স্বীকার করছি। আর আপনার কাছে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি।অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ সমূহ মাফ করতে পারেনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কেউ যদি উক্ত দোয়াটি সকালবেলা পাঠ করে সন্ধ্যার আগেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতি, তেমনিভাবে কেউ যদি মনের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দোয়াটি রাত্রে বেলায় পড়ে এবং সকাল না হতেই মারা যায় সেও জান্নাতি। (বুখারি হাদিস ৬৩০৬, ৬৩২৩)
সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনায় এসেছে যে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আল্লাহ শপথ আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারের ও অধিক ইস্তেগফার ও তওবা করে থাকি।

তাওবা এর আক্ষরিক অর্থ

আল-কামুস (বিখ্যাত আরবি অভিধান) অনুযায়ী, তাওবা শব্দের মানে গুনাহ থেকে ফিরে আসা। এই শব্দ ব্যবহার করা হয় যখন বান্দাহ গুনাহ করার পর তার রবের দিকে ফিরে আসে।

আল হালিমি (রঃ) বলেন, এর (তাওবা) ধরণ হলো এমন, যেন বান্দাহ আল্লাহর কাছ থেকে (গুনাহ করার মাধ্যমে) পালিয়ে গিয়েছিল এবং আবার তার প্রভুর কাছে ফিরে এসেছে (আল মিনহাজ ফী শুয়াবুল ঈমান: ৩/২১)

তাওবার প্রয়োজনীয়তা ও তার গুণাগুণ:

আপনাদের জানা প্রয়োজন, অতীত বর্তমানের সমস্ত আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই বিষয়ে একমত যে, ছোট বড় সমস্ত গুনাহ থেকে যাথে সাথে তাওবা করা ওয়াজিব। আল্লাহর নাযিলকৃত বাণীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।
'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সামনে তাওবা করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন-নূর আয়াত ৩১)

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করো, আন্তরিক তাওবা।" (সুরা আত-তাহরিম, আয়াত ৮)

"আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎসৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন।" (সুরা হুদ, আয়াত ৩)

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, গুনাহসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন।" (সুরা আশ-শুরা, আয়াত ২৫)

"অতঃপর যে স্বীয় অত্যাচারের পরও তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চতই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩৯)

"তারা কেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে না, ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭৪)

"কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুণাহকে ভালো আমল যারা পরিবর্তন করে দেবেন।আল্লাহ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু। (সূরা আল ফুরকান,আয়াত ৭০)

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরুপ:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসেছেন যে "আল্লাহর শপথ। আমি প্রতিদিন ৭০ বারের বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।" (সহীহ বুখারী)

আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে "হে মানুষেরা। তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। কেননা আমি প্রতিদিন একশত বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।" (সহীহ মুসলিম)

আবু মুসা আস আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে "আল্লাহ রাতের বেলা তাঁর রহমতের হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের গুণাহগার বান্দাদের ক্ষমা করতে পারেন। আবার তিনি দিনের বেলা তাঁর রহতের হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুণাহগার বান্দাদের ক্ষমা করতে পারেন। এইভাবে তিনি ক্ষমা করতে থাকবেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় (কেয়ামতের সময় ঘনিয়ে আসে)। (সহীহ মুসলিম)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবার আগ পর্যন্ত যে ব্যক্তিই তাওবা করবে, আল্লাহ আকই ক্ষমা করবেন।" (সহীহ মুসলিম)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, 'আদম সন্তানের যদি পাহাড় পরিমাণ সোনাও থাকে অবুও সে আরো চায়। এমন কি কবরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তায় পেট সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু আল্লাহ তাকেই ক্ষমা করেন যে তাওবা করে।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাদর কোন বান্দাহ যখন তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাওবা করে, আল্লাহ তখন সেই মুসাফিরের চাইতেও বেশী খুশী হন, যে তার উট হারিয়ে ফেলেছে। উটের উপর ছিল তার খাদ্য-পানীয়-সম্বল। তখন সেই মুসাফির সব আশা হারিয়ে হতাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জেগে সে দেখে, তার উট তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দের প্রতিশয্যে সে যখন বলে উঠে, হে আল্লাহ আপনি আমায় গোলাম, আমি আপনার মালিক (এই লোকটি যে পরিমাণ খুশি হয়, বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তার চাইতেও বেশি খুশি হন)। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অম্বুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, "মৃত্যুশয্যায় উপনীত হবার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন।

তাওবা সম্পর্কে সলফে সালেহীনদের বক্তব্য:

এক বাক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) কে এমন একটি পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যা সে করতে চেয়েছিল। কিন্তু করেনি। তিনি লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার যখন ফিরলেন তখন তার চোখে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন, "বেহেশতের আটটি দরজা আছে যার প্রতিটি খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয় শুধুমাত্র তাওবার দরজা ছাড়া। একজন ফেরেশতা এই দরজা পাহারা দিচ্ছেন যাতে তা বন্ধ না হয়। সুতরাং তাওবা কর, হতাশ হয়ো না"

তালাক ইবনে হাবীব (রঃ) বলেন, "একজন বান্দাহ কখানাই আল্লাহর হক (অধিকার) পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করতে পারে না। তাই তোময়া সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে তাওবা কর।"

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রঃ) আল কোরআনের আয়াত "যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৫) উল্লেখ করতেন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে পাপ করে এরপর তাওবা করে এরপর আবার পাপ করে এবং আবারো তাওবা করে।

মুজাহিদ (র:) বলেন, 'যে ব্যাক্তি সকাল-সন্ধ্যা/দিনে রাতে আল্লাহর কাছে তাওবা করে না সে যালেমদের (অন্যায়কারীদের) অন্তর্ভুক্ত।

লোকমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "বৎস। তাওবা করতে দেরি করো না। কারণ মৃত্যু যে কোন মুহূর্তেই এসে যেতে পারে।"
আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (র:) বলেন, "প্রতিবার গোনাহের সময় আল্লাহর যে ক্রোধ, তুমি কখনোই তা সহ্য করতে পারবে না।তাই সকাল সন্ধ্যা তওবা করো।

ফুযাইল ইবনে আয়ায (র:) জিহাদে যাওয়ায় আগে মুজাহিদীনদের বলতেন,তাওবার উপরে অটল থাকো। এটি তোমাকে এমন জিনিস থেকে রক্ষা করবে যা থেকে তোমার তলোয়ার তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা।"

হাসান (র:) বলতেন "হে আদম সন্তানেরা, গড়িমসি করো না। আজই তোমাদের দিন,আগামীকাল নয়।আমি এমন সব মানুষের সাথে মিশেছি যারা অর্থ সম্পদের চাইতে নিজেদের জীবন নিয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন।

এই ছিল তাওবা সম্পর্কে আমাদের পূর্বসুরীদের অনুভূতি। তারা বুঝতে পারতেন যে যদি কোন ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভ ছাড়া তার পুরোটাই খুইয়ে বসে, তবে শোক করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। তদ্রূপ আমাদের এই জীবন মূল্যবান

নিঃশ্বাসের যোগফল। এটি আমাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির মতো যা লাভ হিসেবে জান্নাত এনে দিবে। কিভাবে তাওবা ছাড়া কোন মানুষ এই বিনিয়োগের অপচয় করতে পারে?

একজন মানুষের যৌবন ও বার্ধক্য, সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, সর্বাবস্থায় তাওবা করা জরুরী। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (র:) বলেন, "তাওবার স্টেশন হলো একজন মুসাফিরের প্রথম ট্রেন, মাঝের ষ্টেশন ও শেষের স্টেশন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাওবা তাকে ছেড়ে যায় না। যদি সে অন্য কোন স্টেশনে যায় তবে এই (তাওবার) ষ্টেশনও তার সাথে সাথে যায়। তাওবা বান্দার শুরু ও শেষ। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। "(সুরা আন- নুর আয়াত ৩১)

এই আয়াতটি একটি মাদানী সুরার অংশ, যা অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনগণ ঈমান,হিজরত ও সবরের কঠিন পরীক্ষা দেয়ার পর। এত কিছুর পরেও আল্লাহ তাদের সফলতায় জন্য তাওবাকে শর্ত বানিয়েছেন।

আন্তরিক তাওবা ও তার পূর্বশর্ত

আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো, আন্তরিক তাওবা।" (সুরা আত-তাহরিম, আয়াত ৮)

ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, "এর মানে হলো এমন সৎ ও দৃঢ় তাওবা যা আগের পাপরাশিকে মুছে দেয় এবং তাওবাকারীর মনে এমন অনুভুতির জন্ম দেয় যা ভবিষ্যতে তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে।" (তাফসীর ইবনে কাসীর: ৪/৩৯১)

আলেমদের মতে আন্তরিক তাওবা হলো:

নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে গুনাহ থেকে বিরত রাখা, ভবিষ্যতে আর গুণাহের পুনরাবৃত্তি না করার অংগীকার করা এবং অতীতে কৃত গুণাহের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা করা। আর যদি কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, তবে তার প্রাপ্য (অর্থ, সম্পদ) মিটিয়ে দেয়া।

নিম্নে আন্তরিক তাওবা সম্পর্কে বিখ্যাত কয়েকজন সলফে সলেহীনদের উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন, "আন্তরিক তাওবা হলো গুণাহের দিকে আর না ফেরা, যেমন করে দুধ গাভীর ওলানে আর ফিরে যায় না।"

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, "তাওবা কবুল হবার শর্ত তিনটি তাওবা কবুল না হবার আশংকা, কবুল হবার আশা এবং (আল্লাহর) আনুগত্যের আকাঙ্ক্ষা।"

হাসান (রঃ) বলেন, "আন্তরিক তাওবা হলো পাপকে ঘৃণা করতে ভালবাসা এবং যখনই তা মনে পড়ে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।"

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন, "আন্তরিক তাওবা হলো এমন যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সদুপদেশ দেয়।"
কালবী (রঃ) বলেন, "আন্তরিক তাওবা হলো মন থেকে আনুশোচনা করা, জিহ্বার মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়া, পাপ ধ্বংস করা এবং আর কখনো নিশ্চিতভাবে গুণাহের দিকে ফিরে না যাওয়া।"

কুরযি (রঃ) বলেন, "তাওবার উপাদান চারটি। জিহ্বার মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়া, শরীর থেকে পাপ মুছে ফেলা, পুনরায় গুনাহ না করার সংকল্প করা এবং অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করা।"

ফুজাইল (রঃ) বলেন, "এটি হলো নিজের গুনাহকে এমন ভাবে চোখের সামনে রাখা, যেমন করে কোন ব্যক্তি তাকে সারাদিন দেখতে পায়।” (অর্থাৎ সব সময় নিজের গুণাহের জন্য লজ্জিত থাকা)

আন-নববী (রঃ) বলেন, "প্রতিটি পাপ থেকে তাওবা করা ফরজ। যদি এটি মানুষের অধিকার সম্পর্কিত না হয় তবে এর শর্ত তিনটি পুরোপুরিভাবে গুনাহ পরিত্যাগ করা, আক্ষেপ ও আনুশোচনা বোধ করা এবং পুনরায় গুনাহ না করার সংকল্প করা। এই তিনটির কোন একটি উপাদান না থাকলে তাওবা কবুল হবে না।" (রিয়াদুস সালিহীন: ১৭)

যদি এটি কোন মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয় তবে অতিরিক্ত চতুর্থ আরেকটি শর্ত আছে, অন্য মানুষের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়া (যদি তা অর্থ সম্পর্কিত হয়) অথবা ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে তার অধিকার ভঙ্গের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকেরই জীবনটাকে ভালভাবে কাজে লাগানো উচিত, শেষ বিচারের দিনকে স্মরণ করা উচিত। "যারা শিক্ষা গ্রহন করতে চায় ও শুকরিয়া আদায় করতে চায়, তাদের জন্য আমি দিন ও রাতকে সৃষ্টি করেছি পরিবর্তনশীলরুপে।” (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬২)

হাসান (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, "যে রাতে নিজেকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হলো, তার জন্য দিন আসে। আর যে দিনে নিজেকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হলো, তার জন্য রাত আসে।" তিনি আরো বলেন, "একেকটি দিন মানুষকে ডাকে এবং বলে, 'হে মানুষেরা! আমি একটি নতুন দিন। আজকের দিনে যা করা হবে আ আমি তার স্বাক্ষী।"
ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, "দিন ও রাত হলো সম্পদের গুদাম, সিন্দুক। খেয়াল রেখো তুমি তাতে কি রাখছো। রাত ও দিনকে সঠিকভাবে কাজে লাগাও।"

এই হলো আন্তরিক তাওবা সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য। গভীরভাবে ভাবুন, দেখুন তা কতটা কঠিন। সেটি অর্জন করার চেষ্টা করুন।

তাওবার সময়

আল্লাহ তাওবার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুল বশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হলো সেই সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবজান্তা।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১৭)

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, "জেনে বা না জেনে যে ব্যক্তিই গুনাহ করে, গুনাহ ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সে মুর্খ থাকে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "তার গুনাহ তার অজ্ঞতার অংশ।"

হাসান বসরী (রঃ) বলেন, ".. অনতিবিলম্বে তাওবা করে..' মানে হলো মৃত্যুর আগেই।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এর মানে হলো অসুস্থতার আগে।"

ইবনে রজব (রঃ) বলেন, "অধিকাংশ আলেমদের মতে 'অনতিবিলম্বে' মানে হলো মৃত্যুর আগে, কেননা মৃত্যু খুব নিকটে এবং দ্রুত হয়ে থাকে।"

এই আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার, আল্লাহ শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তাওবা কবুল করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মৃত্যু শয্যায় উপনীত হবার আগ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন।"

এ কারণেই ইবনে রজব (রঃ) বলেন, "এই আয়াতের নির্দেশনা হলো এই যে অসুস্থ হবার আগেই গুনাহগারের তাওবা করা উচিৎ, যাতে সে আল-কোরআনের নির্দেশিত পথে ভুলগুলোকে নেক আমল দ্বারা শোধরাতে পারে।"
তদুপরি, সুস্থ অবস্থায় তাওবা করা হলো সুস্থ দেহে দান করার ন্যায় (যেখানে অন্তিম মুহুর্তের দাবী বা চাপ প্রয়োগ করা হয় (না)। মৃত্যুশয্যায় তাওবা করা হলো মৃত্যুশয্যায় দান করার ন্যায় যখন আর কোন উপায় থাকে না। দুটো অবস্থা (সুস্থাবস্থা ও

মৃত্যুকালীন সময়) কখনো এক হতে পারে না।

আলী (রাঃ) বলেন, 'বান্দাকে নিঃশ্বাস দেয়া হয়েছে যাতে মালাকুল মাওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) চলে আসার আগ পর্যন্ত তাওবা করতে পারে। মালাকল মাংতে চলে এলে আর কোন সময় দেয়া হয় না, তাওবাও কবুল করা হয় না।"
ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "মালাকুল মাওত চলে আসার আগ পর্যন্ত তাওবা করার সুযোগ থাকে।"

হে আল্লাহর বান্দারা, একজন মানুষ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকলে সে তার জীবনের অবৈধ আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকে নিজেকে দূরে রাখে না। আর শয়তান মৃত্যু চলে আসার আগ পর্যন্ত তাকে তাওবা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, গড়িমসি করায়। যখন মৃত্যুযন্ত্রণা এসে পড়ে তখন সে অনুশোচনা করে, নিজের বিলম্বের জন্য

আক্ষেপ করে। সে আবার জীবন ফিরে পেতে চায় তাওবা ও নেক আমল করার জন্য। কিন্তু তখন এগুলো কোন কাজে আসে না। আল্লাহ আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো তোমাদের কাছে আযাব আসার আগেই। যাতে কেউ না বলে, আমি আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেছি। আর আমি ছিলাম ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অথবা যাতে না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথ প্রদর্শন করতেন তবে আমি অবশ্যই পরহেযগারদের একজন হতাম। আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাবো।” (সুরা আয-যুমার, আয়াত ৫৪-৫৮)

আল্লাহ আরো বলেন, "যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।” (সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৯৯-১০০)

"তাদের ও তাদের বাসনার মাঝে অন্তরাল হয়ে আছে।" (সুরা সাবা, আয়াত ৫৪)

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয (রঃ) বলেন, "যখন তারা (মৃত্যুর সময়) তাওবা করতে চাইবে তখন (তাওবা ও তাদের মাঝে) একটি পর্দা টানিয়ে দেয়া হবে।"

হাসান (রঃ) বলেন, "হে আল্লাহর বান্দারা। আল্লাহকে ভয় করো। দুটি জিনিস যেন একই সময় তোমার কাছে এসে না পড়ে- মৃত্যু যন্ত্রনা এবং জীবন হারানোর বেদনা।"

ইবনে সাম্মাক (রঃ) বলেন, যখন তুমি (দুনিয়ার) মূর্তি ও ঘোরের মাঝে থাকো তখন মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুযন্ত্রনা ও কষ্টকে ভয় করো। কেউ জানেনা তুমি কি দেখবে আর কিসের সম্মুখীন হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ (রঃ) বলেন, "দুনিয়া হলো শয়তানের মদ। যে ব্যক্তি এতে আসক্ত হয়ে যায়, মৃত্যু এলে সে তার হুশ ফিরে পায় আর অন্যান্য অভাগাদের সাথে আফসোস করতে থাকে।"

ইবনে রজব (রঃ) বলেন, "মৃত ব্যক্তিরা সেই সময়ের কথা ভেবে আক্ষেপ করতে থাকে যে সময়টায় তারা কোন তাওবাও করেনি, নেক আমলও করেনি।" I

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয (রঃ) বলেন, "সেই ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যে (তাওবা করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে) আল্লাহর রহমত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এভাবে সে আসমান ও জমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলো। সে চিরস্থায়ী নেয়ামতের বিনিময়ে ক্ষণিকের ভোগ-বিলাস, বিপুল পরিমাণ নেয়ামতের বিনিময়ে তুচ্ছ পরিমাণ কিনে নিল।"

ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন, "অভিনন্দন তাকে যে তাওবার দ্বারা নিজের গুনাহগুলোকে মুছে ফেললো, আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার আগে নিজের ভুলগুলোকে সংশোধন করে নিলো এবং অসম্ভব হয়ে উঠার আগে সম্ভবপর জিনিসের পিছনে ছুটলো।" (তাবসিরাহ: ১/২৬)

তিনি (রঃ) আরো বলেন, "তুমি কি এমন কাউকে দেখেছ যে দুনিয়ার চোরাবালিতে আটকে যায়নি? এমন কাউকে কি দেখেছ যে অসুস্থ হয়নি? এমন জীবন কি দেখেছ মৃত্যু এসে যাকে শেষ করে দেয়নি? এই পৃথিবী ধোঁকা দেয়, ঠেকিয়ে রাখে। এখানে

আনন্দ মন্দের দিকে নিয়ে যায়। যে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয়, দুনিয়া তাকে ধ্বংস করে। যারা এর থেকে লাভ পেতে চায়, দুনিয়া তাদের ক্ষতি করে। দুনিয়া প্রত্যাশী যারা উল্লাস করে, এটি একদিন তাদের কাঁদাবে। তারা একদিন (মৃত্যুর আগে) আফসোস করবে তাদের পদস্খলনের জন্য, যে সময় তারা দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করেছিল। ভয়, আতংক ও আশংকা তাদের কাবু করে ফেলবে। তারা অন্তত একটি ঘন্টা হলেও বেঁচে থাকতে চাইবে।"

হাসান বসরী (রঃ) বলেন, "হে আদম সন্তানেরা তাওবা করার চাইতে পাপ বর্জন করা অনেক সহজ।”

তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার লক্ষণ

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার অনেকগুলো লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

তাওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ:

১। বান্দাকে তাওবার পর আগের চাইতে ভাল হতে হবে। এর মানে হলো, তাওবাকারী ব্যক্তির দেখা উচিত তার নেক আমল বেড়েছে কি না এবং বদ আমল বা গুণাহের পরিমান কমেছে কি না।

২। মনে সবসময় আল্লাহর ভয় থাকা উচিৎ। আল্লাহর রাগ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হবে না।

৩। তাকে সব সময় ভয় ও অনুশোচনা সহ সতর্ক থাকতে হবে।

৪। তাকে আরো বেশী বিনয়ী হতে হবে। নিজেকে তুচ্ছ ও অধম মনে করে আল্লাহর কাছে বিনীত ভাবে দোয়া করতে হবে, 'হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের নামে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বলছি, আপনি আমার উপর রহমত করুন। আপনার শক্তিমত্তা ও আমার দুর্বলতা, আপনার বিত্ত আর আমার দারিদ্র্য স্মরন করে আপনার কাছে চাইছি। আপনার সামনে এই অপরাধী মাথা নত করছি। আমি ছাড়াও আপনার আরো অনেক বান্দাহ আছে। কিন্তু আমার রব, আমার প্রভুতো কেবলই আপনি। আপনি ছাড়া আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই, নেই কোন আশ্রয়। আমি আপনার কাছে নিঃস্ব ভিক্ষুকের মত হাত পেতেছি। আমি কাকুতি মিনতি করছি যেমন করে একজন দীন-হীন

অসহায় মানুষ কাকুতি মিনতি করে। আমি একজন ভয়ার্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ বান্দার মত চাইছি। আমি তার মত করে আপনার কাছে কামনা করছি যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দেয়, যেমন করে কেউ আপনার জন্য নিজের মান মর্যাদা ত্যাগ করে। আমি আপনার কাছে চাই সেই বান্দার মতো যে কান্নাকাটি করে আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।'

এগুলো হলো তাওবা কবুল হওয়ার লক্ষণ।

তাওবা কবুল না হওয়ার লক্ষণ:

১। তাওবাকারীর সংশোধনে দুর্বলতা। পাপ কাজের আনন্দ তার মনে পড়ে যায় এবং তার মন তাতে ডুবে যায়।

২। তাওবাকারী নিজের তাওবা কবুল হবার বিষয়ে এতোটাই নিশ্চিত হয়ে যায় যে সে মনে করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

৩। চোখে পানি আসে না, গুণাহের শাস্তির কথা ভুলে যায়, মন শক্ত হয়ে যায়।

৪। তাওবাকারী নিজের নেক আমল বাড়ানোর কোন চেষ্টা করে না।

আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, আমাদের সবসময় ভুল হয়, আমরা নিয়মিত গুনাহ করি। তাই নিয়মিত তাওবার মাধ্যমে আমাদের এ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা উচিৎ, যেমন করে নোংরা কোন গর্তে পড়ে গেলে কোন মানুষ সেখান থেকে উঠে নিজেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যদি তোমরা অপরাধ না করো তবে আল্লাহ সেই সব মানুষদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যারা পাপ করে এবং আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়। তখন আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।"

ইবনে রজব (রঃ) এই হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন, "মাঝে মাঝে মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার পিছনে আল্লাহর কিছু কারণ আছে। সেটি হলো, এতে করে তারা নিজেদের তুচ্ছ, ছোট মনে করে এবং অযাচিত গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করে। গর্বভরে ইবাদত করার চাইতে এটা আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।"

হাসান বসরী (রঃ) বলেন, "মাঝে মাঝে বান্দাহ এমন অপরাধ করে যা সে কখনোই ভোলে না। তখন এর গ্লানি থেকে সে অনেক বেশী ভীত থাকে যতক্ষণ না জান্নাতে প্রবেশ করে।"

তাওবাকারীদের শ্রেণীবিভাগ

তাওবাকারীদের মুলত দুইটি শ্রেণীবিভাগ আছে। এক পক্ষ হলো যারা আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে, অন্য পক্ষ হলো যারা আন্তরিকতা নিয়ে করে না। প্রত্যেকেরই বিবেচনা করা উচিৎ তার অবস্থান কোন শ্রেণীতে।

সংকল্পের উপর ভিত্তি করে ইমাম গাযালী (রঃ) তাওবাকারীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১ম শ্রেণীঃ

যে ব্যক্তি তার তাওবার উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৃঢ় থাকে, তার গুণাহের স্খলন ঘটায় না এবং যেসব ক্ষেত্রে কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না এমন সব ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ঐ গুনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। এটা হলো ধারাবাহিক ও নিয়মিত তাওবা। যারা এটি করতে পারে তারা সেই সব মানুষের অন্তর্ভুক্ত যারা নেক আমলের পিছনে ছোটে। এই তাওবাকে বলে আন্তরিক ও খাঁটি তাওবা আর তাওবাকারীর হৃদয়কে বলে প্রশান্ত আত্মা।

"হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে যাও। অতঃপর আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সুরা আল-ফজর, আয়াত ৩০)

২য় শ্রেণীঃ

এমন তাওবাকারী যে তার তাওবার ক্ষেত্রে আন্তরিক এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে অনিচ্ছা থাকা সত্বেও পরিস্থিতির কারণে গুণাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যখনি সে গুনাহ করে, তখনি নিজের মনকে তিরষ্কার করে, ভুলের জন্য দগ্ধ হয়। এটি হলো তিরষ্কারকারী বা সমালোচক আত্মা, কেননা এটি সব সময় নিজেকে ভুলের জন্য তিরষ্কার করে। এই ধরণের তাওবাকারী আল্লাহর কাছ থেকে খুশির খবর পেয়েছে।

"যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে, ছোট খাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদুর বিস্তৃত" (সুরা আন-নাজম, আয়াত ৩২)

অধিকাংশ আলেমের মতে সগীরা গুনাহ হলো হারাম জিনিসের দিকে তাকানোর মত

৩য় শ্রেণীঃ

এমন বান্দাহ যে তাওবা করে এবং তদানুসারে নিয়মিত কাজ করে, তবে মাঝে মাঝে তীব্র আবেগ বা লালসার বশবর্তী হয়ে গুনাহ করে বসে। কিন্তু সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুগত্য বজায় রাখে এবং মোটের উপর গুনাহ থেকে দূরে থাকে। সে সার্বক্ষণিক তাওবার মাধ্যমে নিজের আত্মার যত্ন নেয়। এই আত্মা তার কাজের জন্য দায়ী এবং এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। "আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাশীল হবেন।" (সুরা আত-তাওবা, আয়াত ১০২)

আশংকা আছে, এই ব্যক্তি হয়তো তাওবা করার আগে মারা যাবে। তাই তার এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিৎ এবং তার তাওবার উপরে অটল থাকা উচিৎ।

৪র্থ শ্রেণীঃ

এমন ব্যক্তি যে একবার তাওবা করে কিন্তু আসক্তির কারণে পুনরায় গুণাহের মাঝে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এরপর তার জন্য অনুশোচনাও বোধ করে না, তাওবাও করে না। এ ব্যক্তি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা গুণাহের ভিতরে ডুবে থাকে। তাদের অন্তর নিয়মিত তাদেরকে গুণাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে তাদের মৃত্যু কঠিন কোন পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

যদি সে তাওহিদের উপর মারা যায়, তবে হয়তো দোযখের আজাব ভোগ করার পর তাকে মুক্তি দেয়া হতে পারে। এমন কি অজানা কোন কারণে তাকে সম্পূর্ণ মাফও করে দেয়া হতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষমার উপর আশা করে বসে থাকা মোটেও যৌক্তিক নয়।

কিছু লোক আছে যারা বলে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অসীম। যদি কেউ এদের বলে, "আল্লাহ যদি এত মহান ও উদার হয়ে থাকেন তবে কেন তোমরা নিজেদের ঘরে বসে থাকো না এবং আল্লাহর জন্য অপেক্ষা করো না যে তিনি তোমাদের ভরন পোষণের ব্যবস্থা করে দিবেন?" তারা তখন মুখ ফিরিয়ে বলে, "ভরন পোষণ শুধু উপার্জনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়"। তাদের দাবির প্রতিউত্তরে একই ভাবে এই কথাই বলা উচিত "মুক্তি মিলতে পারে তাকওয়ার মাধ্যমে, কেবল মাত্র আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে থাকার মাধ্যমে নয়।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, ভেবে দেখুন আপনি কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, "অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মাঝে মনোনীতদেরকে কিতাব দান করেছি। তাদের কেউ নিজেদের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আবার তাদের কেউ কেউ কল্যাণের পথে অগ্রগামী। এটাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।" (সুরা আল-ফাতির, আয়াত ৩২)

ইমাম কুরতুবী (রঃ) এই আয়াতের একটি ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন, "যারা ছোট গুনাহ করে তারা যালেম। যারা দুনিয়া ও আখেরাতের প্রাপ্য মিটিয়ে দেয় তারা মধ্যপন্থী। আর যারা ভাল কাজের পিছনে দৌড়ায় তারা সব চাইতে এগিয়ে।"

তাই আমাদের দিনে রাতে সর্বাবস্থায় তাওবা করা উচিৎ, যাতে আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়ি। "যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালেম।" (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১)

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, "যারা সকাল সন্ধ্যা তাওবা করে না তারাই যালেম।"

আমাদের সলফে সালেহীনদের চরিত্র এমন ছিল যে তারা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার উপর নির্ভর করতেন, যদিও তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতেন। তারা নিজেদের কাজের উপর নির্ভর করতেন না।

একজন ইবাদতকারী এত বেশী ইবাদত করতেন যে তার বুকের পাঁজর দেখা যেত। একজন তাকে বললো, "আল্লাহর দয়া অসীম।" তিনি উত্তর দিলেন, "ঠিক বলেছেন, যদি তাঁর দয়া অসীম না হতো তবে আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের জন্য ধ্বংস করে দিতেন, গুণাহের কথা তো বাদই দিলাম।"

হুজাইফা ইবনে কাতাদা (রঃ) বলেন, "যদি কেউ আমাকে কসম করে বলে, আল্লাহর শপথ! আপনার আমল তো কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাসীদের মতো।" আমি তাকে বলতাম তার শপথ সঠিক, তাকে এর জন্য কাফফারা দিতে হবে না। I

সলফে সালেহীনরা তাদের আমল সম্পর্কে কখনই উচ্চাশা পোষণ করতেন না, তারা যতই আল্লাহর ইবাদত করুন না কেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারারাত জেগে নামাজ পড়তেন, অনেক সময় তাঁর পা গুলো ফুলে যেতো। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেয়ার পরও কেন তিনি এইরুপ করেন, তিনি বলতেন, "আমি কি শুকরিয়া আদায়কারী বান্দাহ হবো না?"

আব্দুর রাহমান ইবনে হামরাজ আল হারাজ (রঃ) বলেন, "তোমার নিজের ভেতরের সব খারাপ দিকগুলো খুঁজে দেখ। প্রত্যেককে তার নিজের স্বরুপে পুনরুজ্জিবীত করা হবে। যার ভিতরে সব ধরণের পাপ আছে তাকে সব ধরণের লোকের সাথে রাখা হবে।" তারপর তিনি নিজের সমালোচনা করে বলেন, "একজন ঘোষক আগামী দিন ঘোষনা করবে 'অমুক অমুক গুনাহগার লোকেরা, দাঁড়াও!' সুতরাং হে আরাজ তুমিও দাঁড়াবে তাদের সাথে। তখন আরেকটি ঘোষনা দেয়া হবে 'অমুক অমুক গুনাহগার লোকেরা, দাঁড়াও!' সুতরাং আবার হে আরাজ তুমি তাদের সাথে দাঁড়াবে। আমি দেখতে পাচ্ছি এভাবে তুমি সব দলের সাথেই দাঁড়াবে।"

তাওবার কিছু নিয়ম

তাওবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আছে। আমরা অত্যন্ত প্রাসংগিক কিছু নিয়ম উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ

ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেন,

১। তাওবা করতে গড়িমসি না করা।

গুনাহ করার সাথে সাথে তাওবা করা ফরজ। যদি কেউ তাওবা করতে দেরি করে তবে সে তার জন্য দায়ী হবে। যদি সে পরে তাওবা করে, তবে তাওবা করতে দেরি করার জন্য আলাদা করে তাওবা করতে হবে।

২। একটি গুনাহ থেকে তাওবা করা, অন্যটি থেকে নয় এমন যেন না হয়।

একটি গুনাহ থেকে তাওবা সঠিক ও খাঁটি হবে না, যদি দেখা যায় একই রকম আরেকটি গুণাহে সে লিপ্ত। কিন্তু যদি, যে গুনাহ থেকে তাওবা করা হচ্ছে, অন্য গুনাহটি একই রকমের না হয় তাহলে তার তাওবা সঠিক ও খাঁটি বলে ধরা হবে। I

উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ মদ থেকে তাওবা না করে সুদ খাওয়া থেকে তাওবা করে, তাহলে তার সুদ সংক্রান্ত তাওবা সঠিক ধরা হবে। কিন্তু কেউ যদি হাশিশ (এক ধরনের মাদক) গ্রহণ থেকে তাওবা করে কিন্তু মদ পান চালিয়ে যায়, তাহলে তার এই তাওবা সঠিক হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি এক মহিলার সাথে ব্যভিচার থেকে তাওবা করলো, অন্য মহিলার সাথে ব্যভিচার থেকে করলো না। তাহলে বাস্তবে এটি কোন তাওবাই হলো না।

৩। তাওবাকৃত গুণাহের দিকে ফিরে না যাওয়া।

কেউ কেউ বলেন তাওবা কবুলের পূর্বশর্ত হলো যেই গুনাহ থেকে তাওরা করা হচ্ছে তা আর না করা। কিন্তু বেশীরভাগ আলেমরা বলেন যদি কোন বান্দাহ নিজেকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে, অনুশোচনা করে, সেই গুণাহের পুনরাবৃত্তি না করার সংকল্প করে তাহলে তাওবা বৈধ এবং ইনশাআল্লাহ তা কবুল করা হবে। আবার গুণাহের দিকে ফিরে আসলেও তার আগের তাওবা অবৈধ হবে না, যদিও তাকে পুনরায় তাওবা করতে হবে।

শাইখ রুস্তাকি (রঃ) বলেন,

৪। "আমি তাওবা করিনি কারণ আমি জানতাম আমি আবার গুণাহের দিকে ফিরে যাব" এমন ধারণা হলো শয়তানের প্ররোচণা। কেউ জানে না তার মৃত্যু কখন হবে। তাওবার আগেও কেউ মারা যেতে পারে। বান্দার কাজ হলো তাওবা করা।

আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতে তাকে হয়তো গুনাহ ত্যাগ করার দৃঢ়তা দান করবেন। যদি কেউ আবার গুনাহ করেও বসে, তবুও অন্তত সে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং তাওবার মাধ্যমে পূর্বের গুনাহ থেকে নিজের অপবিত্রতা মুছে ফেলেছিল। তাওবাকারী সব সময় কোন না কোন উপকারিতা পায়। যদি আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন, তাহলে বোঝা যাবে তিনি তাকে খুবই পছন্দ করেন।

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের খুবই পছন্দ করেন।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)

আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত হলো আদি পিতা আদম (আঃ), যিনি জান্নাতে একটিমাত্র ভুল করার পরেও নিয়মিত বেশী বেশী তাওবা করেছেন। আমরা অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি করি, গুনাহ করি। আমাদের উচিৎ নিয়মিত তাওবা করে যাওয়া এবং আল্লাহর উপর আস্থা না হারানো।

৫। তাওবার পর করণীয়।

তাওবার পর একজন মানুষের আরো বেশী বিনয়ী ও আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা উচিত। তার আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে দিয়েছেন এমন ধারণাও মনে পোষণ করা উচিৎ নয়। এটি আরেক ধরণের অহংকার, যা নিজেই একটি গুনাহ। ইবনে হাওয়ারী (রঃ) বলেন, একজন বান্দাহ কোন গুণাহের জন্য তাওবা এবং সে গুণাহের জন্য এত বেশী অনুশোচনা করে যে, সে তার এই অনুশোচনার ও মর্মপীড়ার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করে। তখন শয়তান আফসোস করতে থাকে কেন সে লোকটিকে শুরুতে কুমন্ত্রনা দিয়েছিল।

৬। যখন অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জানানোও তাওবার অন্তর্ভুক্ত।

হানাফি, শাফেয়ী ও মালেকি মাযহাবের মতানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতির ব্যাপারে জানানো প্রয়োজন। তাঁরা রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদিসটি উল্লেখ করেন "যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতি করে, তার অবশ্যই তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ সেই দিনটি চলে আসার আগে যেদিন বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম হবে নেক আমল ও বদ আমল।"

সাধারণত গুনাহ দুইটি হকের সমষ্টি একটি হলো আল্লাহর হক, অন্যটি বান্দার হক। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে তাওবার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বান্দার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এই জন্য খুনের ক্ষেত্রে তাওবা পূর্ণতা পাবে না যতক্ষণ না নিহত ব্যক্তির উত্তরাধীকারদেরকে ক্ষমা অথবা প্রতিশোধ, এই দুয়ের কোন একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। I

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জানানো বাধ্যতামুলক নয়। একজন মানুষ এটি ছাড়াও তাওবা করতে পারে। কারণ গুণাহের প্রদর্শনী করে কোন লাভ নেই। এতে কেবল ক্ষতি আর বিশৃঙ্খলাই বাড়বে যা ইসলামে হারাম। তবে যদি কেউ কারো সম্মানহানি করে বা গীবত করে, তাহলে অন্য কোন সময় তার প্রশংসা করতে হবে।"

৭। তাওবাকারী কি তার পূর্বেকার পর্যায়ের ঈমান ফিরে পায়?

কেউ কেউ বলেন, সে গুণাহের আগেকার ঈমানের অবস্থায় ফিরে যায় না। তাকে তার আগের ঈমান ফিরে পেতে হলে তার পরিবেশ তৈরি করতে হয়।

অন্যান্যরা বলেন সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, কারণ তাওবার দ্বারা তার গুনাহ এমন ভাবে মাফ হয়ে যায় যেন সে আদৌ কোন গুনাহ করেনি।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, "বিষয়টি আপেক্ষিক। কেউ হয়তো তার আগের মানে ফিরে যেতে পারে, কেউ হয়তো তার চাইতে উন্নত মানে পৌঁছে যায়।" এর ব্যাখ্যায় একটি গল্প বলা যেতে পারে।

এক মুসাফির শান্তিপূর্ণভাবে এবং সঠিক গতীতে পথ চলছে। সে কিছুক্ষণ দৌড়ায়, কিছুক্ষণ হাঁটে, কিছুক্ষণ পথ চলে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। পথিমধ্যে সে একটি মরুদ্যান দেখতে পেল যেখানে একজন পথিকের মন মতো পরিষ্কার পানি, পর্যাপ্ত ছায়া ও বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা আছে। তখন সেই পথিক গিয়ে উঠলো সেখানে। হটাৎ একদল ডাকাত এসে তাকে আক্রমণ করে বন্দি করলো। সে তার জীবনহানির আশংকা করতে লাগলো এবং আফসোস করতে লাগলো ঠিকমত গন্তব্যে পৌঁছতে না পারায়। এরপর যখন সে ঘুমিয়ে ছিল তখন তার বাবা তাকে উদ্ধার করলেন এবং বললেন, তোমার সফর চালিয়ে যাও। এইসব শত্রুদের থেকে সাবধান থাকো। এরা তোমাকে হামলা করার জন্য ওত পেতে আছে। যদি তুমি সাবধান থাকো, তবে তুমি তাদের শিকার হবে না। আর যদি অসাবধান হও, তবে তুমি এর ফল ভোগ করবে।

যদি সে মুসাফির বুদ্ধিমান হয়, তবে সে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং আগের চাইতে আরো ভালভাবে সফর করবে। শেষ পর্যন্ত সে তার গন্তব্যে আগের চাইতে আরো ঝামেলামুক্তভাবে ও দ্রুত পৌঁছাবে। কিন্তু যদি সে সাবধান না হয়, শত্রুদের সাথে তার মোকাবেলার কথা ভুলে যায়, তাহলে পরিণতিতে তার প্রাপ্য ফল ভোগ করবে।

৮। তাওবার প্রকারভেদ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, "তাওবা দুই প্রকার। ফরজ ও মুস্তাহাব। ফরজ তাওবা করা হয় যখন কোন ফরজ ছুটে যায় বা হারাম কাজ করা হয়। আর মুস্তাহাব তাওবা করা হয় যখন কোন মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়া হয় বা মাকরুহ কাজ করা হয়। যে যথাযথ ভাবে প্রথম তাওবা করে সে মাঝারি মানের পরহেযগার। আর যে উভয় ধরণের তাওবা করে সে আল্লাহর নিকটবর্তী ও অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা কোন ধরণের তাওবাই করে না তারা হলো যালেম।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওবা ও ইস্তেগফার এর উপর খাস নিয়্যাত এ আমল করার তাওফিক দান করুন।

আমিন।

বই এর রেফারেন্স সমূহ:

১.ইস্তিগফার-অনুপম ক্ষমার হাতছানি (শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল)

শাইখ নাসির আল ফাহাদ-এর 'মুজিবাতুল ইসতিগফার' পুস্তিকা অবলম্বনে।

২. গুনাহর অপকারিতা-সংকলন(মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ)

সম্পাদনা (শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী)

৩.কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গুনাহ'র চিকিৎসা। সম্পাদনা- মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ)

৪.আন্তরিক তাওবা

ইমাম আবু হামিদ গাযালি (রঃ)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া (রঃ)

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি (রঃ)

সংকলনেঃ আবু মারইয়াম মাজদি ফাতহি আল সাইদ